ধর্ম, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ এবং...

ইরাবান বসুরায়

ব্রিটিশ-ভারতে বা অন্য-কোনো উপনিবেশ ঘটে যাওয়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলিকে খুব সহজেই চিহ্নিত করা হতো সাম্রাজ্যবাদীদের উশ্‌কানির ফল হিশেবে তেমনি পনেরোই আগস্ট, উনিশশো সাতচল্লিশের পর ভারতে বা পাকিস্তানে নানা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে চিহ্নিত করা হয়েছে কায়েমি স্বার্থের সৃষ্টি বলে; অন্য দেশের নানাবিরলের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকেও এই ছক-অনুসারেই বিচার করা হয়েছে এবং এই সিদ্ধান্তগুলিকে একেবারে অমূলক বলা চলে না। যদিও সমাজতান্ত্রিক বলে পরিচিত সোভিয়েত ইউনিয়নে নানা জাতির মধ্যে সংঘর্ষ এবং আর্মেনীয় ও আজার বাইজেনীয়দের সংঘাতে জাতি-পরিচয় ছাড়িয়ে খ্রীস্টান ও মুসলমান এই ধর্মীয় পরিচয় বড়ো-হয়ে ওঠাকে এইসব ছকে মেলানো সম্ভব হয় না কোনো মতেই। আর্থনীতিক ও রাজনীতিক স্বার্থে দাঙ্গা বাধিয়ে দেওয়ার উদাহরণ পৃথিবীর সব প্রান্ত থেকেই অজস্র পরিমাণে সংগ্রহ করা যায় ভারতেও ছেচল্লিশের 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককালের ভাগলপুরের ঘটনা পর্যন্ত একই ইতিহাস পুনরাবৃত্ত হচ্ছে প্রায়, প্রশ্ন তোলা যায় শুধু এই সরলীকৃত একমাত্রিক কারণকেই কি নির্দিষ্ট করা যাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভূমিকা বলে। নানা কারণেই এ-ব্যাপারে প্রশ্ন জাগে। এ-কথা ঠিক যে, যে-কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাতেই দেখা যায় মূলত নানা মহলের প্রশ্রয়পুষ্ট গুণ্ডারাই অগ্রণী ভূমিকা নেয়, এবং দাঙ্গার সুযোগে লুটতরাজ, খুন ধর্ষণ ইত্যাদি নানা অসামাজিক কাজ সাময়িকভাবে নির্বাধ হয়ে দাঁড়ায়; তবু একটি কথা অস্বীকার করা যায় না, জনসংখ্যার তুলনায় সামাজবিরোধীরা সবসময়েই মুষ্টিমেয়। কোনো ব্যক্তিবিশেষের প্রতি সমাজবিরোধীদের আক্রমণ সবসময় প্রতিহত করার উপায় না-থাকলেও অসংখ্য মানুষে গড়া একটি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অন্য সম্প্রদায়ের মুষ্টিমেয় ব্যক্তি আক্রমণ চালালে তা আটকানো যাবে না, এটি সহজ যুক্তিতে টেঁকে না। তবু যে এমনটি ঘটে, তার কারণ দ্বিবিধ। প্রথমত এই আক্রমণ আর দু-একজন ব্যক্তির ব্যাপার থাকে না, তা হয়ে দাঁড়ায় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সম্প্রদায়ের আক্রমণ; অর্থাৎ আক্রান্ত তখন আক্রমণকারীর পিছনে অনেক বড়ো একটি ছায়াকে অনুভব করে। দ্বিতীয়ত এই অনুভবের ফলেই এই আক্রমণকে টেকানোর পথ হিশেবে সে বেছে নেয় প্রতি-আক্রমণের রাস্তা, এবং সেই প্রতিআক্রমণও ঐ মুষ্টিমেয় আক্রমণকারীকে ছাড়িয়ে ধাবিত হয় ঐ ছায়াটির দিকে, এবং ছায়াকে তখন শরীরী অস্তিত্বেই খোঁজা হয়। এই ছায়া দেখা সম্পূর্ণ অমূলক নয়, কেননা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যখন বাধে, তখন দাঙ্গারত দুটি সম্প্রদায়েই এমন অনেক ব্যক্তি দেখা যায় যাঁরা এমনিতে কোনো সংঘর্ষ হাঙ্গামা, খুনজখম ইত্যাদি পছন্দ করেন না, কিন্তু সুপ্ত এক

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে মনে মনে লালন করেন। তাঁদেরই পরোক্ষ, কখনো-বা ঈষৎ সরল সমর্থন থেকে যায় এর পিছনে। আরেক দল না-সমর্থন না-বিরোধিতার নীতিতে বিশ্বাসী—আর বড়ো একটি দল মনে মনে বিরোধীতা করলেও প্রকাশ্যে কিছু বলতে চান না, নিশ্চিন্ততা ও নিরাপত্তা বজায় রাখার আশায়—এদের এ-ভূমিকা আসলে দাঙ্গার পরোক্ষ সমর্থন হয়ে দাঁড়ায়। আসলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঠেকানোর রাস্তা ক্ষোভ জানানো বা সম্প্রীতির বাণী প্রচার নয়, এক সম্প্রদায়ের আক্রমণের বিরুদ্ধে আরেক সম্প্রদায়ের প্রতি আক্রমণ নয়, দাঙ্গাবাজ ও তাদের নেপথ্যচারী নিয়ামকদের বিরুদ্ধে আক্রমণই দাঙ্গা বন্ধ করতে পারে। কিন্তু ব্যাধির উৎসে পৌঁছনোও খুব জরুরি।

প্রশ্নটি তাহলে চেতনার স্তর সম্পর্কিত, সাম্প্রদায়িকতার ধারণাটি লালিত হয় কোথায়, কীভাবে এবং কেন? জাতিগত সাম্প্রদায়িকতা আর ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা দুটোই মারাত্মক বিষ, কিন্তু এই দুই সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে একটা প্রভেদ আছে, সে-প্রভেদ তাদের প্রকৃতিতে ততটা নয়, কারণে। জাতিগত ক্ষেত্রে কখনো বা বঞ্চনার চাপ থেকে যে বিক্ষোভ তৈরি হয়, তাই রূপ পায় জাতিবিদ্বেষে, এ-ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়েই শোষণ, সুযোগ সুবিধার অভাব ইত্যাদির জন্য যে-শ্রেণী দায়ী, সেই শ্রেণীকে কোনো একটি বিশেষ জাতির সঙ্গে একাত্ম করে দেখা হয়। অবশ্যই এখানেও ভ্রান্ত ধারণাকেই স্বার্থান্বেষী মহল থেকে উশ্‌কে দেওয়ার চেষ্টা হয়। কিন্তু ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে এমন কোনো কারণও থাকে না। সেখানে মুলত যে-আবেগেরই উপর জোর দেওয়া হয়, তা একধরনের অহংবোধ—অবশ্যই তা সমষ্টিগত অহংবোধ। এতে কোনো যুক্তি থাকে না, যদিও তা কখনো কখনো যুক্তির ভান করতে চায়। আমার ধর্মই শ্রেষ্ঠ—এই ধারণাটি চালতি করতে থাকে চেতনাকে আর এই ফাঁপা শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাকে পরিপুষ্ট করতে চাওয়া হয় কখনো অতীত গৌরবের দোহাই কেড়ে, কখনো-বা সত্যদর্শনের, ঈশ্বরের প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার গরিমায়। স্পষ্টতই এগুলি যুক্তির ভান, যুক্তি নয়। কিন্তু এই ভান যে শ্রেষ্ঠত্বের বোধ সঞ্চারিত করে দেয়, তাই এনে দেয় সম্প্রদায়গত শ্রেষ্ঠত্বের আবেগ, তারই সঙেগ এসে যায় অন্য ধর্ম ও ধর্মীয় সম্প্রদায় যে নিকৃষ্ট এই ধারণা—এর থেকে আসে অবজ্ঞা। ফলে বিদ্বেষের বীজটা থেকেই যায়—কোনো বিশেষ ঘটনায় বা উপলক্ষে সেই বিদ্বেষ বেড়ে ওঠে মাত্র। সেই সঙ্গে যদি এমন কোনো রটনা বা ধারণা ছড়িয়ে যায় যে তার ধর্ম বা সেই ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বকে কোনোভাবে অবমাননা করা বা চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে, তা হলে এই শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান তীব্র বিদ্বেষে ফেটে পড়তে চায়। আর ধর্মকে যেহেতু নানা প্রকারে, নানা পদ্ধতিতে, এবং রাষ্ট্রিক সামাজিক সব স্তরেরর নানা কার্যকলাপে প্রধানতম অভিজ্ঞান করে তোলার চেষ্টা চলে, এবং এ-ভাবে ব্যক্তি ও সম্প্রদায়কে সংযুক্ত করা হয় অন্যান্য পরিচয় থেকে সরিয়ে এনে এই অভিজ্ঞানের পবিত্রতা রক্ষার দায়িত্বে সেই বিদ্বেষ মানসিকভাবেই হয়ে ওঠে

আক্রমণাত্মক; নিজে যদি বা আক্রমণে এগোন না যায়, তার পরোক্ষ সমর্থন থেকে যায় এর পিছনে। এই নৈতিক সমর্থনই সবথেকে বেশি বিপজ্জনক, কেননা সাম্প্রদায়িক দঙ্গা যদি শুধু ঘটনানির্ভর হতো, তাহলে সেই ঘটনার রেশ কেটে যাওয়ার পর এবং ভবিষ্যতে সে-রকম ঘটনার বিরুদ্ধে সতর্কতা নিলেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে বন্ধ করে দেওয়া যেত। কিন্তু তা হয় না, এই মানসিক সমর্থন বিদ্বেষকে জিইয়ে রাখে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়, ছোটোখাটো ব্যাপারে, আচরণে, কথায় সেই বিদ্বেষ কখনো সূক্ষ্মভাবে, কখনো বা স্থূলভাবে প্রকাশ পায়। এই বিদ্বেষ তখন আর ঘটনার উপর নির্ভর করে না, তা ঘটনা খুঁজে নেয়, বা তৈরি করে নেয়।

এই ভ্রান্ত নৈতিক সমর্থন ও বিদ্বিষ্ট চেতনা কাজ করে কাজের মধ্যে। মানতেই হয়, সহজ ধারণার ব্যতিক্রম ঘটে যায় এখানে। প্রচলিত ধারণা এই যে শিক্ষাই যেহেতু চেতনা আনে, তাই শিক্ষার বিস্তারই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ও বিদ্বেষের মনোভাবের অবশান ঘটাবে। কিন্তু এই সমীকরণ অধিকাংশ সময়েই মেলে না। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার হিশাব নিলে দেখা যায়, গ্রামাঞ্চলে নয়, দাঙ্গার মূল ঘটনাস্থলগুলি শহরেই, এবং যদিও শহরের দরিদ্র অশিক্ষিত শ্রমজীবীদের মহল্লাগুলিই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, স্পষ্টতই তারা দাঙ্গার শিকার, শিকারী নয়। দাঙ্গার উশ্‌কানি আনে শহরে উঁচুপাড়া থেকেই এবং আশ্চর্যজনকভাবেই এতে অংশ নেয় মধ্যশ্রেণীর মানুষরা, যে-শ্রেণী সর্বদাই নিজেদের খুব রুচিবান, সংস্কৃতিমনস্ক বলে দাবি করে। ছেচল্লিশের দাঙ্গায়, প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, ভদ্রলোক বলে পরিচিত যুবক-প্রৌঢ়েরাই মহোল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল শত্রুনিধনে তারা কেউই অশিক্ষিত সমাজবিরোধী নয়, মোটামুটি লেখাপড়াজানা ক্লাব-ফাংশান ব্যায়াম সমিতি করা মধ্যশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তি তারা, দাঙ্গা থেমে যাওয়ার অনেকদিন পরেও এইসব ভদ্রজনেরা যেমন কটি অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ মেরেছেন, সেই সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে গর্বিতবোধ করেছে, তেমনি পাড়ায় তাদের শ্রদ্ধা না করা হলেও, একটু স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। চৌষট্টি সালে কলকাতার দাঙ্গা মহোৎসাহে কলেজস্ট্রিট পাড়ার জুতোর দোকানের লুটতরাজে গুণ্ডাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে মধ্যশ্রেণীর মানুষ, আর ছাপোষা গৃহস্থরা বিনা দ্বিধায় লুট-করা মাল কিনেছে সস্তায়। প্রায় সব দাঙ্গাতেই এটি স্বাভাবিক চিত্র, চেতনার স্তর নিয়ে প্রশ্ন তুললে মনে হয়, এমনটি হওয়াই সম্ভব, কেননা সাম্প্রদায়িক মনোভাব রীতিমতো চর্চার ফসল। আর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাস্তবতাকে ছাড়িয়ে তা তৈরি করে নিতে চায় ভিন্নতর এক ধারণা, আর সেই ধারণার পরিপুষ্টি হয় একধরনের অর্ধশিক্ষাতেই, বস্তুত তথাকথিত অশিক্ষিত জনসাধারণ তাদের দৈনন্দিনের অভিজ্ঞতায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের তেমন কোনো কারণ খুঁজে পায় না আর শ্রেণীস্বার্থ তাদের পরস্পরকে অনেকটা পথ একসঙ্গে হাঁটতে বাধ্য করে। কিন্তু যে শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের অন্যতম প্ররোচক, সেই ধারণাটি যেমন আসে

কিছুটা পড়াশোনার সুবাদে, তেমনি ধারণাটিকে সঞ্চারিত করে দিতে চাওয়া হয় সাধারণ মানুষের মধ্যেও, সাধারণ মানুষ হয়ত দাঙ্গা করে না, তাদের সহজ স্বাভাবিক সংস্কার, মানবিকবোধ, শান্তিতে থাকার ইচ্ছা ইত্যাদি তাকে আক্রমণকারীর ভূমিকা নিতে দেয় না—কিন্তু বাইরে থেকে সঞ্চারিত ঐ ধারণা তাকে এক ধরনের ভক্তির শিকার করে দেয়। ঐ ভীতি আর অবিশ্বাসের মানসিকতা তখন টলিয়ে দিতে চায় তাদের অভিজ্ঞতাকেও, তার ফলেই তাদের ভূমিকা হয়ে দাঁড়ায় নিরপেক্ষ, অভাব ঘটে যায় পারস্পরিক সহযোগিতার—যা প্রকারান্তরে সাহস জোগায় দাঙ্গাকারীদের।

কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার জন্য সম্প্রদায় লাগে। মানবজাতি নানা ধরনের সম্প্রদায়ে বিভক্ত—সেই বিভক্তিতে একটি বড়ো ভূমিকা ভৌগোলিক সীমানার। দেশ, ভাষার স্বাতন্ত্র্য তৈরি করে দেয় আলাদা-আলাদা সম্প্রদায়, তাদের চেনা যায় দেশের কিংবা ভাষার নামে। ভাষার নাম যে-সম্প্রদায়ের পরিচয় তা অপরিবর্তনীয়—এখানে ব্যক্তির পক্ষে সম্প্রদায় বদলও সম্ভব হয় না, বদলাতে গেলে তাকে বইতে হয় ছদ্ম-পরিচয়ের ভার। দেশগত পরিচয় অনেকটাই ভাষাগত পরিচয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যদিও একই দেশবাসী দুজনের স্বতন্ত্র ভাষাভাষী এমন উদাহরণ সহজলভ্য যেমন, তেমনি একই ভাষাভাষী দুজন স্বতন্ত্র দেশের অধিবাসী—এও দেখা যাবে অজস্র। দেশগত পরিচয়কে অবশ্য কিছুটা বদলে নেওয়া যায়, যদিও একজন বাঙালি বা জার্মান মার্কিন নাগরিক হলেও তার এই অর্জিত পরিচয়ে কিছুটা জুড়ে থাকে পূর্বপরিচয়ও। কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি হয় অদ্ভুত এবং কিছু পরিমাণে জটিল, যে জটিলতার কোন যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। ভাষাগত বা দেশগত পরিচয় শুধু ব্যক্তিক পরিচয় হতে পারে না; ভাষা যেহেতু ভাববিনিময়ের একটি মাধ্যম, তাই ভাষাগত পরিচয় অবশ্যই নির্ভর করে ব্যক্তির পরিবেশ, প্রতিবেশের সঙ্গে সংযোগের উপর। অন্যদিকে দেশগত পরিচয় মূলত সামাজিক যোগসূত্রের উপর নির্ভরশীল, রাষ্ট্র বা দেশ ব্যক্তিবিশেষকে নিয়ে নয়, সমষ্টি ছাড়া তার অস্তিত্ব নিরর্থক। কিন্তু ধর্মীয় পরিচয়ের ক্ষেত্রে এমন হওয়ার কথা নয়। বস্তুত ধর্মের অভিধানিক অর্থ যাই হোক-না-কেন, তার প্রচলিত ও ব্যবহারি তাৎপর্য হলো ঈশ্বরের সম্পর্কিত ধারণা ও তাকে উপাসনার বিশেষ পদ্ধতি। আর তাই যদি হয়, তাহলে তা হওয়া উচিত সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপারকে ঈশ্বরকে কীভাবে কল্পনা করবে এবং ভরসা করবে, তা ঠিক করার দায়িত্ব ও অধিকার সম্পূর্ণ তার নিজস্ব। কিন্তু এই একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারটা কোনমতেই ব্যক্তিগত থাকতে পারে না—ফলে কোনো ব্যক্তির ধর্মীয় পরিচয় হয়ে ওঠে সম্প্রদায়গত পরিচয়; বৌদ্ধধর্ম অবশ্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাসী নয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মূল দর্শনের জায়গা বাদ দিয়ে তারও প্রতিষ্ঠানগত চেহারা দাঁড়ায় অন্য ধর্মের মতোই আর এখানেই থেকে যায় এক দ্বেষ। ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপারে, তার কাজ পরোক্ষ স্বীকৃতি হলো কেউ যদি ধর্মান্তরিত হতে চান, তিনি একাই

তা হতে পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তার পরিচয় বদলে যায়, পুরনো পরিচয়ের ছাপ আর সেখানে লেগে থাকে না। কিন্তু মুশকিল হলো এই ব্যক্তিক স্বাধীনতাকে স্বীকার করে না কেউই, কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় নয়, সমাজ নয়, রাষ্ট্র নয়। এমনকী ব্যক্তি নিজেও নয়। ব্যক্তি একা ধর্মান্তরিত হতে পারে—কিন্তু তা নতুন পরিচয়ে আরোপ সম্প্রদায়গত পরিচয় হয়ে ওঠে—সে আসলে এক সম্প্রদায় থেকে অন্য সম্প্রদায়ের আশ্রয়ে চলে যায়। ব্যক্তিও স্বস্তি খুঁজতে চায় সম্প্রদায়ের ছায়ায়, তার ব্যক্তিগত ঈশ্বর-ভাবনাকে সে বেঁধে নিতে চায় সম্প্রদায়ের অনুশাসনে। নাস্তিকদের কোনো দল নেই, তাই তাদের সামাজিক বা রাষ্ট্রিক স্বীকৃতি নেই কোনো।

ব্যক্তি যখন সম্প্রদায়ের আশ্রয় নেয়, স্বাভাবিকভাবেই সম্প্রদায় তখন তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে, আর এই নিয়ন্ত্রণ হয়ে ওঠে ব্যাপক। আসলে ধর্ম শুধু ঈশ্বর ভাবনার বৈশিষ্ট্য বা উপাসনার পদ্ধতি থাকে না, তা হয়ে দাঁড়ায় অনেকটা ছড়ানো ও গভীরে চলে যাওয়া ধারণা সেই ধারণা কোন ব্যক্তির স্ব-সৃষ্ট নয়, তা ধর্ম নামক সংগঠনের চাপিয়ে দেওয়া বিধান। সংগঠন মাত্রেরই কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম ও প্রথা থাকে যা দিয়ে সেই সংগঠনকে চেনা যায়, আলাদা করা যায়—সেই নিয়ম ও প্রথা সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত সবাইকে মেনে চলতে হয়, সে সংগঠন যতই আপাতভাবে শিথিল হোক-না-কেন। এই বিধানগুলি হয়ত তৈরি হয়েছিল বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতিতে—আর সেইসব সামাজিক পরিস্থিতি আমূল বদলে যাওয়ার পরও ধর্মবিধান বদলাতে চায় না; কিন্তু কোনো ধর্মগুরুর মুখনিঃসৃত বাণী বা কোন পুণ্যগ্রন্থে লিখিত যাই হোক-না-কেন এই বিধানগুলি বাঁধতে চায় ব্যক্তির সবধরনের কাজকর্মকে, দৈনন্দিনের পরিসরে হয়ত ততটা নয়, কিন্তু তার অস্তিত্বের নানা দিককে। ফলে নিতান্ত স্বাস্থ্যবিধি-সংক্রান্ত নিয়ম বা সামাজিক চুক্তিও এসে যায় ধর্মীয় অনুশাসনের আওতায়—জন্মের পরবর্তী আচার, শিশুর নামকরণ বা প্রথম অন্নগ্রহণ, বিবাহ, ইত্যাদি ব্যাপারও নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে ধর্মীয় প্রথা অনুসারে—পরিচালনা করে পুরোহিত জাতীয় লোকেরা, শুধু তাই নয় ধর্ম হয়ে উঠতে চায় সংস্কৃতির অন্য নাম। এ-কথা ঠিক যে সব দেশে, সব জাতিগোষ্ঠীর মধ্যেই শিল্পসাহিত্যের একটি বড়ো অংশ ধর্ম বা দেবতাভিত্তিক, কিন্তু তার বাইরেও সংস্কৃতির যে প্রকাশ মানুষের প্রাত্যহিক আচারে, তাতেও ধর্ম হস্তক্ষেপ করতে চায়, একসময়ে দেখা যায় ধর্মীয় অনুশাসনে ঈশ্বরভাবনাই গৌণ হয়ে যায় কিন্তু সম্প্রদায়ের বন্ধন এতই শক্ত যে দেখা যায়, কোনো ব্যক্তি ঈশ্বরবিশ্বাসী না হয়েও, বা ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত নানা পদ্ধতি অনুসরণ না করে, অর্থাৎ পূজার্চনা বাদ দিয়ে চলে, মন্দির-মসজিদ-গির্জায় না গিয়েও, অন্যান্য ক্ষেত্রে, বিভিন্ন উপলক্ষে, সামাজিক অনুষ্ঠানে পুরোহিত, মৌলবি, পাদ্রির অনুশাসন মেনে চলতে বাধ্য হন, তাই ব্যক্তির পরিচয়েও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে ছাপিয়ে ওঠে ধর্মীয় চাপ। ব্যক্তির নামকরণ এর একটা বড়ো

উদাহরণ। ভারতীয় হিন্দু হয়ত সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে তার ধর্মগত আত্মীয়তার ফলে সুবিধা পেয়ে যায়, সেই ভাষা থেকে তুলে আনতে পারে তার নাম, কিন্তু ভারতীয় মুসলমান তার ভারতীয়ত্ব সত্ত্বেও জাতিগত ভাষাগত পরিচয় চাপা দিয়ে নামের মধ্যে বয়ে বেড়ায় আরবের অনুষঙ্গ, ভারতীয় খ্রিস্টানের নামে শোনা যায় ইংরেজ বা পর্তুগিজের প্রতিধ্বনি। অন্যদিকে ধর্মান্তরিত মার্গারেট নোবলকে হতে হয় নিবেদিতা, ক্যাসিয়াস ক্লে-র বদল ঘটে মহম্মদ আলিতে। সংস্কৃতির উপর ধর্মের এই ছায়াবিস্তারের ফলে রামায়ণ মহাভারতের মতো দুটো অসাধারণ মহাকাব্যকে হিন্দুরা করে তোলে ধর্মগ্রন্থ, মহাকাব্যের মহিমা ঢাকা পড়ে যায় ভক্তির বিহ্বলতায়, অন্যদিকে ভারতীয় মুসলমান এদের অস্পৃশ্য মনে করে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের জন্য দ্বারস্থ হয় আরব্যকাহিনীর ভারতীয় খ্রিস্টানকে নির্ভর করতে হয় যিশুবিষয়ক আখ্যানের উপর। এখানে ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো দাম থাকে না। ধর্মনিরপেক্ষভাবে কেউ যদি অন্যভাবে উৎসাহী হতে চান, তা হয়ে দাঁড়ায় শুধুই মননের চর্চা, সামগ্রিক সাংস্কৃতিক চর্চায় ধর্মের অনুশাসনকে এড়ানো সম্ভব হয় না।

অবশ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির সম্পর্কটি একটু জটিল। ধর্ম সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনেক উৎসাহ ও উপাদান জুগিয়েছে। ধর্মের উপাদান নিয়ে গড়ে উঠেছে ভাস্কর্য, স্থাপত্য, চিত্রালয় খাজুরাহো, কোনারক, মহাবলীপুরম সাঁচী, ইলোরা অজন্তার মতো মহান মানবিক সৃষ্টি য়ুরোপীয় ভাস্কর্যও চিত্রকলায় বিশেষ ধারায় তৈরি হয়ে গেছে খ্রিষ্ট্রীয় কাহিনীর অনুষঙ্গে, মুসলিম মসজিদ স্থাপত্যের নতুন মহিমা তুলে ধরতে পেরেছে। কিন্তু এগুলি চোখে দেখার জিনিস-সেখানে তার ধর্মীয় পটভূমি ছাড়িয়ে নান্দনিক অভিঘাতই বড়ো হয়ে ওঠে। সেই নান্দনিক অভিজ্ঞতাই এগুলিকে করে তোলে সংস্কৃতির অংশ—যার উত্তরাধিকার ধর্মনির্বিশেষে সবার উপরই বর্তায়। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি একটু অসুবিধাজনক হয় সম্ভবত। আধুনিক যুগে প্রবেশের আগে পর্যন্ত সাহিত্য ছিল মূলত ধর্মনির্ভর— সেখানে স্বভাবতই সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ভাবনার প্রতিফলনই বেশি। এই অতিরিক্ত ধর্মনির্ভরতার ফলে পরবর্তীকালেও কোনো পাঠকের পক্ষে সেই ধর্মীয় অনুষঙ্গকে অস্বীকার করা সাহিত্যের পাট নেওয়ায় অসুবিধা তো থেকেই যায়। যুগ ও সমাজ পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে সাহিত্যকে অনুধাবন তো বিশেষ বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা—তার বাইরে সাহিত্যকে সাধারণ পাঠকের কাছে ধর্মগ্রন্থেরই গোত্রীয়, ফলে যে-সাহিত্য ভাষাবিশেষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেরই অন্তর্গত, তাই সেই ভাষাভাষীর কারও কারও কাছে অগ্রহণীয় হয়ে ওঠে। এখানে গ্রহণ-বর্জন দু-ক্ষেত্রেই সংস্কৃতিকে ভুল করা হয় ধর্ম বলে। আবার অন্যদিকে ধর্মীয় প্রথাকে চালিয়ে দেওয়া হয় সংস্কৃতির প্রকাশ বলে, স্বাভাবিকভাবেই তখন ভিন্ন ধর্মের মানুষের মনে এক ধরনের প্রতিরোধ তৈরি হয়। সংস্কৃতির নামে ধর্মীয় প্রথাকে চালানোর চেষ্টা অবশ্য সংখাগরিষ্ঠরাই করতে পারেন ও করে থাকেন।

ফলে ধর্ম হয়ে ওঠে এক নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা। আর যে নিয়ন্ত্রণ সম্প্রদায় বা সঙ্ঘ দ্বারা নির্দিষ্ট হয় অন্যের বিরুদ্ধে—এক সময় তা নিয়ন্ত্রিত করতে চায় সংগঠনের ভিতরকেও। ফলে ব্যক্তির বিরুদ্ধে তা প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠে—এখানে সামগ্রিক স্বার্থে ব্যক্তির স্বার্থকে কমিয়ে দেখা হয় না। ব্যক্তিকে খণ্ডন করা হয় ব্যক্তিরই উন্নতির নামে, সে-উন্নতি অবশ্য জাগতিক নয়, পারমার্থিক, অর্থাৎ বায়বীয়। ব্যক্তিকে এভাবে খর্ব করা হয়; অথচ মজার ব্যাপার এই, বর্তমানে প্রচলিত ধর্মগুলির মধ্যে হিন্দু ধর্ম ছাড়া আর সবই ব্যক্তির দ্বারাই প্রবর্তিত। হিন্দু ধর্ম যে তার নয়, তার কারণ হিন্দু ধর্মের স্পষ্ট কোনো পরিচয় চিহ্ন—শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব বা অদ্বৈতবাদী, বৈদান্তিক ইত্যাদি নানা মতের সমাহার এই ধর্ম, এই ভিন্ন মতগুলি গড়ে উঠেছে ব্যক্তিরই প্রবর্তনায়, কিন্তু নানা মতের এমন সমাহারের ফলে হিন্দুধর্ম আপাততভাবে শিথিল, তাকে মনে হয় অনেক উদার। এই শৈথিল্য আর ঔদার্যের ছদ্মবেশ তার একটা বড়ো শক্তি। হিন্দুধর্ম অনেকটা জাতীয় কংগ্রেসের মতো, একটা প্লাটফর্ম, ফলে বহু ধরনের স্বার্থই এখানে পরিপুষ্ট হতে পারে। অন্য ধর্মগুলি গড়ে উঠেছে ব্যক্তির প্রবর্তনায়, কিন্তু ধর্ম কখনো ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা ব্যক্তিগত থাকতে পারে না, কোনো সময়ে কোনো বিশেষ ব্যক্তি তাঁর ঈশ্বরোপলব্ধি বা আধ্যাত্মিক অনুভূতির সঙ্গেই মানবজাতিকে পরিত্রাণের দায় অনুভব করেন—ফলে তাঁকে শিষ্য জোগাড় করতেই হয়, সেই শিষ্যদের একই ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রয়োজন হয় সাংগঠনিক শৃঙ্খলার তৈরি করতে হয় সঙ্ঘ, রচনা করতে হয় বিধিবিধান, করণীয় ও নিষিদ্ধ কর্ম ও আচরণের তালিকা, আর সেগুলি ঠিক মতো পালনের জন্য ব্যবস্থা রাখতে হয় পারিতোষিক ও শাস্তির। অর্থাৎ ধর্ম ব্যক্তির ব্যক্তিগত উপলব্ধিকে ছাড়িয়ে ক্রমশ হয়ে ওঠে একটি প্রতিষ্ঠান—যা হয়ত বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানই। তখন মানবমুক্তির জন্য অসংখ্য মানুষকে শিক্ষা দেওয়া বা বোঝানোর সহজতম পথ হয়ে ওঠে তাদের নিজের সংগঠন বা সঙ্ঘের আওতায় নিয়ে আসা—আনতে পারলেই সে কয়েকটি নিয়মে বাঁধা পড়ে যাবে, সেই নিয়মেই তাকে পরিত্রাণের পথ দেখিয়ে দেবে, এমনই ভাবা হয় তখন। ব্যক্তি কেন প্রতিষ্ঠানের দিকে এগিয়ে আসে, সে প্রশ্ন তোলা যায় নিশ্চয়ই। আসলে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি অসহায়, দেবতা বা ঈশ্বর তার আর্ত মনের কাল্পনিক আশ্রয়, কিন্তু সেই কল্পিত সর্বশক্তিমানকে সে কীভাবে জানাবে তার আশা-আকাঙ্ক্ষা তা ভেবে পায় না সে—প্রতিষ্ঠান তাকে কিছু পদ্ধতি দেখিয়ে দেয়। সাধারণ মানুষ ঈশ্বরের স্বরূপ বা তাকে জানার দর্শন নিয়ে মাথা ঘামায় না, ঈশ্বর তার কাছে প্রয়োজনীয়, কাজেই কয়েকটি ছক-বাঁধা পদ্ধতি পেয়ে গেলে সে স্বস্তি পায়, পদ্ধতির যাথার্থ্য বা সফলতা নিয়েও সে প্রশ্নাতুর নয়, কেননা এখানে তো সে একা নয়, অনেকে তার সহযোগী, ফলে ব্যক্তি এতে স্বস্তি পায়। আর একটা সময় পদ্ধতিটিই তার কাছে, তাদের কাছে একমাত্র সত্য হয়ে ওঠে, ঈশ্বর ভাবনা গৌণ হয়ে যায়, ধর্মপ্রবর্তকের

উপলব্ধি ইত্যাদি, গল্পকথা হয়ে আর একটি আনুষ্ঠানিক স্মর্তব্য আধারে পরিণত হয়, নিশ্চিন্ত আত্মসমর্পণ ঘটে তখন। সব ধর্মই তাই যুক্তি নয়, জোর দেয় বিশ্বাসের উপরই, এমনকী যারা যুক্তির কথা বলে শুরু করে তারাও। এই নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের ব্যাপারটা কোনো কারণে নাড়া পেলে তার প্রতিবাদে জন্ম নেয় নতুন ধর্ম, সেই নতুন ধর্মও কিছুদিন পরে পরিণত হয় আবারো এক নতুন প্রতিষ্ঠানে। ঐ নাড়া লাগাটা ঘটে কোনো ঐশ্বরিক বিধানে বা ঈশ্বর-ভাবনা পাপে নয়, নিতান্তই সামাজিক চাপে।

সামাজিক প্রয়োজনেই নতুন ধর্ম জন্ম নেয় ঠিকই, কিন্তু বিশ্বাসের ব্যাপারটাই গোলমেলে। যে-কোনো পুরনো ধর্মে বিশ্বাসের দাবি খুব বেশি হয়ে ওঠে, যে-বিশ্বাস অন্ধত্বেরই নামান্তর কিন্তু তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে যে নতুন ধর্ম আসে, তাও তো দাবি করে বিশ্বাস ও আনুগত্য ঈশ্বরের যিনি অথবা মুক্তির পথ একমাত্র সেই জানে, এই থাকে তারও ঘোষণা। সত্যের একচেটিয়া অধিকার পুরনো-নতুন সব ধর্মই দাবি করে। এই সত্য আপেক্ষিক সত্য, সামাজিক পরিবর্তনের চাহিদা অনুসারে তার উদ্ভব, যদিও তা চিরন্তন সত্য হিশেবেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। ফলে যে সামাজিক পরিবর্তনের আকাঙক্ষার চাপে একটি ধর্মমতের জন্ম হয়। সেই সামাজিক অবস্থাটি যখন আবার বদলে যায়, তখন স্বাভাবিক ভাবেই সেই ধর্মমতটির আর কোনো প্রাসঙ্গিকতা থাকে না। ক্যাথলিক ধর্মের বিরুদ্ধে যে-প্রতিবাদ থেকে প্রোটেস্টান্ট ধর্মের জন্য হয়েছিল, তাপ পিছনের সামাজিক রাজনীতিক কারণ য়ুরোপের ইতিহাস থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়, যেমন ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রিক বিবর্তনের ধারা থেকে অনুধাবন করা যায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করে বৌদ্ধধর্মের জন্মের কারণ। আরবের বিচ্ছিন্ন বেদুইন গোষ্ঠীগুলি বিভেদ ও শত্রুতার অবসান ঘটিয়ে ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী আরব রাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনীয়তা সঙ্গে ইসলামের অভ্যুত্থানকে মিলিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু সূচনায় সেই অবস্থার বদল ঘটলেও। এমনকী সামন্ততন্ত্র পেরিয়ে ধনতন্ত্রের চূড়ান্ত দশায় পৌঁছেও বিভিন্ন সমাজ সেইসব পুরনো ধর্মকে আঁকড়ে রাখে, পুরনো ধারণা ও নিয়মনীতি সহ। একে আপাতভাবে মনে হতে পারে ধর্মেরই নিজস্ব কোনো শক্তি। এক আকর্ষণীয় শক্তি ধর্মের নিশ্চয়ই আছে বিশেষত তার পরমার্থিক প্রতিশ্রুতি মানুষকে তার ব্যক্তিগত বা সামাজিক নানা দুঃখদুর্দশায় সান্ত্বনা জোগায়, অচ্ছন্ন করে রাখে কিন্তু আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক মূল্য নয়, ধর্মের আসল গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত সামাজিক অবস্থাকে, সেই সঙ্গে রাষ্ট্রব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার সহায়ক ভূমিকায়। সহায়ক, কেননা ধর্ম আবেদন রাখে শ্রেণীস্বার্থের বিপরীতে এক তথাকথিত সার্বজনিক ঐক্যের যদিও তার কোনো ভিত্তি নেই, এবং ধর্ম মাত্রই তার সংগঠনের ভিতরে নানা স্তর তৈরি করে রাখে, সেই স্তরগুলি ধর্ম বা জাতের সুবাদে চূড়ান্ত বৈষম্যের নমুনা হয়ে থাকে। এছাড়া সামাজিক বৈষম্যগুলি যে আসলে শ্রেণীস্বার্থের কারণেই তৈরি, এবং তার অবসান

পার্থিব পথেই সম্ভব এই বৈজ্ঞানিক সত্যের বদলে ধর্ম সেখানে চায় জাগতিক দুর্দশাগুলি মায়া বা পূর্বজন্মের কর্মফল বা তা কোনো আদিম পাপের দায়, সুতরাং এর হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। তার বদলে ঈশ্বরের রাজ্যেই আছে সব পরম প্রাপ্তি। রবীন্দ্রনাথ রক্তকরবী নাটকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন ধর্মের এই স্থিতাবস্থার সহায়ক ভূমিকার কথা। কিন্তু এই বক্তব্যগুলি যে কিছু পরিমাণে গ্রহণীয় বলে মনে হয়, তার কারণ ধর্ম শ্রেণীনির্বিশেষে সার্বজনিক ঐক্যের জন্য একধরনের নৈতিক মূল্যবোধের কথা বলতে থাকে। কিন্তু এই নৈতিকতার বাণী ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত বস্তুত যে-সমস্যা সামাজিক এবং যার জন্য সামাজিক প্রতিবিধানই প্রয়োজন, ধর্ম তাকে নৈতিকতার প্রশ্ন করে তোলে, ফলে কর্তব্য ও অপরাধ হয়ে ওঠে পুণ্য অথবা পাপ। অপরাধের শাস্তি আছে, পাপের শাস্তি তো ঈশ্বরের হাতে, ফলে পাপ, অনুশোচনা, প্রায়শ্চিত্ত অথবা এ-সবকে উপেক্ষা করে ঈশ্বরের বিধানের জন্য অপেক্ষা ইত্যাদির আড়ালে অপরাধ ঢাকা পড়ে যায়। এই নৈতিকতা অবশ্য বড়ো অপরাধগুলিকেই আড়াল করে—শ্রেণী সমাজে নিপীড়িত শ্রেণীগুলির ক্ষেত্রে এই নৈতিকতা কোনো রক্ষাকবচ হয় না, তখন ঈশ্বরের বিধান মর্ত্যের প্রতিনিধিদের মুখ থেকেই নিঃসৃত হয়, তাদের দ্বারাই প্রযুক্ত হয়। কিন্তু শ্রেণী সমাজের ভিত্তিকে চ্যালেঞ্জ জানাবার ধারণাকে নৈতিকতার প্রশ্ন দিয়ে গুলিয়ে দেওয়া যায়। আবার অন্যদিকে যে-ব্যাপারগুলি জাগতিক তা স্পষ্ট, কিন্তু পাপপুণ্যবোধ যেহেতু অনির্দিষ্ট কতগুলি ধারণার সমষ্টিমাত্র, সাধারণ মানুষের অজ্ঞানতা তার সামনে খুব অসহায় বোধ করে, তাই তাদের মনে এক ধরনের ভীতি কাজ করতে থাকে। ফলে যা নৈতিকতার ভান করে, তা আসলে এক মনস্তাত্ত্বিক চাপ, সেই চাপ সাধারণ মানুষকে বেঁধে রাখে ধর্মীয় নিগড়ে, শাস্ত্র বাণীর অনুশাসনে।

আর এই কারণেই ধর্মকে অতীতমুখী হতে হয়। সামাজিক ব্যস্ততার চেহারার সঙ্গে ধর্মীয় সমাধান বা উপদেশের কোনো মিল থাকে না, বরং থাকে সংঘাত, তাই ধর্ম কল্পিত বাস্তবতার উপর নির্ভর করে, সেই বাস্তবতাকে স্থাপন করে সুদুর অতীতে—তাই তাকে বলতে হয় সত্যযুগের কথা, নন্দনকাননের কথা। আর সেই কল্পিত অতীত যুগের অবসানের জন্য ধর্মকে দায়ী করে মানুষেরই স্বজ্ঞান বা অজ্ঞানকৃত পাপকে, আর এভাবেই গোটা মানবসমাজকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে সে প্রতিবাদ ও প্রতিবিধানের নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে, সংশয় জাগিয়ে দেয়, আর পরিবর্তে কোনো অলীক অবতারের, পরিত্রাতার পুনরাবির্ভাবের মায়া তৈরি করে। বর্তমানের বিরুদ্ধে অতীতকে দাঁড় করানোর জন্য সবসময় অবশ্য কল্পনা নয়, কল্পনা বা বাস্তব অতীতকে মহিমান্বিত করে তোলার চেষ্টা করা হয়—বোঝানো হয় বেদই সব সত্যের আধার। অতীতকে গৌরবান্বিত করতে গিয়ে অবশ্য অধিকাংশ সময়েই অস্বীকার করা হয় ইতিহাসকে, তার বদলে তা তৈরি করতে চায় এক পুরাণ, সেই পুরাণ অসম্ভবকে বাস্তব বলে প্রতিপন্ন করতে চায়, ইতিহাসকে বদলে দেয়,

আর একটি সীমায় পৌঁছে তা খর্ব করতে চায় মানবিক যা-কিছু তাকেই। অথচ ধর্ম শুরু করে অতীত নয়, ভবিষ্যতের কথা বলে। পুরনো প্রথা বা সংস্কারকে ভেঙে নতুন কিছু গড়ার কথাই শুধু নয়, ধর্ম তার সূত্রপাতে বলতে চায় ভবিষ্যতের মুক্তির কথা। মুশকিল হলো এই মুক্তি কোনো সমাজ বা শ্রেণীর জন্য নয়, তা প্রতিটি ব্যক্তিকে আলাদাভাবে অর্জন করতে হবে। অথচ এই বিচ্ছিন্ন যাত্রাকে একজায়গায় বাঁধতে না পারলে ধর্ম টেকে না, সম্প্রদায় ভেঙে যায়, গুরু বা প্রচারকের কোনো ভূমিকা থাকে না। অতীতভাবনা, পুরাণের মায়া এখানে অনত্যম গ্রন্থি হিশাবে কাজ করে। এক রূপ-কাহিনী সব বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে বাঁধে—ঐতিহ্য হয়ে; এই ঐতিহ্যগরিমা একটি বড়ো অবলম্বন।

গরিমার উল্টোপটেই থেকে যায় বিদ্বেষ। নিজেকে মহিমান্বিত করে তোলায় প্রধান উপায় অন্যকে খাটো করা। তাই যাবতীয় ঔদার্যের কথা বলা সত্ত্বেও সব ধর্মই অন্য ধর্ম সম্পর্কে বিদ্বেষের কথা বলতে বাধ্য হয়। এই বিদ্বেষ যেমন ধর্মের তত্ত্বের মধ্যেই নিহিত থাকে। তেমনি তাই বাইরের কার্যধারায় এই বিদ্বেষের নানাবিধ প্রকাশ থেকে যায়, যার একটি কারণে সম্ভবত রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে ধর্মের আঁতাত। এ-কথা ঠিক ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক সরলরেখায় চলে না। বহিরাগত আর্থ বা সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে গড়ে তুলেছিল যে বহু দেবপূজক ধর্ম ও তার দার্শনিক ভিত্তি, তা নিয়ে গিয়েছিল ত্যাগের রাষ্ট্রীক শক্তি হিশেবে বিকাশের ধারার সঙ্গে। খ্রীষ্টধর্ম যতদিন ছিল রোমক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ইহুদি ও অন্যান্য নিপীড়িত জাতির ধর্ম ততদিন তাকে প্রবল অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে, পরে তা রাজধর্ম হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তার ভূমিকা বদলে গেছে। প্রোটেস্ট্যাণ্ট মতবাদের বিদ্রোহের সংযোগ ছিল রাজনীতিক বিদ্রোহের সঙ্গে। পরবর্তীকালে তাই গৃহীত হলো বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজধর্ম হিশেবে, রোমের আধিপত্যের বাইরে যে-রাষ্ট্রগুলি স্বাধীন রাজনৈতিক অধিকার চেয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের পিছনে সায় ছিল শ্রেষ্ঠীদের—সম্ভবত শ্রেষ্ঠীরা কিছুটা মনের মিল চেয়েছিলেন বৌদ্ধধর্মে কর্মের প্রাধান্যে অলস, পরভোজী ব্রাহ্মণদের বিপরীতে—সামাজিক বিন্যাসে শ্রেষ্ঠীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বৌদ্ধধর্মকে তার লোকায়ত পাদপীঠ থেকে তুলে এনে পরিণত করে সমাজের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের ধর্মে, রাজশক্তি তাকে নিজেদের ধর্ম বলে মেনে নেয়, আর বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটে অশোকের আনুকূল্যেই—আবার এই পৃষ্ঠপোষকতা হারানোর পরই পুনরুত্থিত ব্রাহ্মণ্যধর্মের কাছে হার মানতে হয় তাকে। রাজশক্তির প্রসারিত বাহু থেকে ঝরে না-পড়লে পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে সংস্কৃতির রূপেও পৌঁছত না হিন্দুধর্ম, মধ্যযুগে রাজ্যবিস্তার ও ইসলাম ধর্মের বিস্তার ঘটেছে একই সঙ্গে, তেমনি আধুনিক যুগেও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহায়ক হিশেবেই খ্রীষ্টধর্ম পৌঁছে গেছে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকায়। ফলে ধর্মপ্রচারের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় পেশীশক্তির যোগ থেকেই যায়, যদিও তার সঙ্গে যুক্ত হয় কিছুটা কুটনীতিও। রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের এই

সংযোগের ফলে আর ধর্মীয় সংস্কার দৃঢ়মূল হয়ে থাকার ফলে রাষ্ট্র, রাজনীতি ও ধর্ম অনেক সময় একাকার হয়ে যেতে চায়, তখন তাদের আলাদা অভিজ্ঞান চোখে পড়তে চায় না। সাম্প্রতিককালে শ্রীলঙ্কায় যেমন রাষ্ট্রশক্তি প্রচ্ছন্নভাবে বৌদ্ধ প্রভাবিত এবং সিংহলী-তামিল বিরোধ বৌদ্ধদের সঙ্গে বিরোধে পর্যবসিত হয়, তেমনি অন্যদিকে সুস্পষ্ট রাজনীতিক সংগ্রামও ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যাত হয়। তাই আইরিশ মুক্তিসংগ্রামের প্রশ্নে ক্যাথলিক-প্রোটেট্যান্ট দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গ এসে যায়, প্যালেস্তানীয়দের মুক্তিসংগ্রাম বহু দেশে সমর্থন পায় ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের দাবিতে, আর কাশ্মীরি জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের ন্যায়সংগত অধিকারের জন্য লড়াইকে বহু সংবাদপত্রে চিহ্নিত করা হয় ইসলামী সংগঠনের ধর্মান্ধ জেহাদ বলে। রাষ্ট্রশক্তিকে ধর্মের আনুকূল্য করে তখনই, যখন ধর্মের বাণী হয়ে ওঠে স্থিতাবস্থার সহায়ক। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিস্ময়কর অগ্রগতি। দুটি বিশ্বযুদ্ধ, বহু পুরনো মূল্যবোধ ভেঙে যাওয়া—এইসব কারণে আধুনিক রাষ্ট্রে আপাতভাবে তেমন গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় না—যদিও রাষ্ট্রের কাছে ধর্মের প্রয়োজন থেকেই যায়। যে সব রাষ্ট্র নিজেদের কোনো বিশেষ ধর্মালম্বী বলে ঘোষণা করে, তারা রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে ধর্মকে ব্যবহার করে সোজাসুজি—তাদের অবস্থান স্পষ্ট। যেগুলি তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, তারা একটা সীমা পর্যন্ত এই নিরপেক্ষতা মেনে চলে। তার পরই মূলত সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ধর্মীয় প্রভাব রাষ্ট্রের উপর বিশাল ছায়া ছড়ায়। ধর্মকে রাষ্ট্রের প্রয়োজন হয় নানাভাবেই। মূল কারণ অবশ্য শোষণ বজায় রাখা, তবে ভারতের মতো আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশে সে-প্রয়োজন এক ধরনের, উন্নত পুঁজিবাদী দেশে তা আরেক ধরনের। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলিতে ধর্মকে গুরুত্ব দেওয়ার বড়ো কারণ হলো ধনতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ শূন্যতা ও সংকটকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা। পুঁজিবাদ তার ব্যবহারিক প্রকাশে ভোগবাদকে প্রশ্রয় দেয়, আর তা এক আদর্শহীন জড়বাদ। সেই সঙ্গে তা প্রশ্রয় দেয় চূড়ান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা। আদর্শবাদী সামগ্রিক কল্যাণে ব্রতী বস্তুবাদের আছে এক সৃজনশীল অভিব্যক্তি—ভোগবাদে তা নেই, তা জন্ম দেয় নানা অবক্ষীয় ভাবনার, বিকৃতির, একটা পর্যায় পর্যন্ত পুঁজিবাদ একে উৎসাহ জোগায়, কারণ তা কোন প্রতিবাদের সম্ভাবনাকে চাপা দিয়ে রাখতে পারে—কিন্তু একসময় এ হয়ে ওঠে তার নিজের অস্তিত্বের পক্ষেই বিপজ্জনক, সংক্রামক রোগের মতো। তখন আধ্যাত্মিক সান্ত্বনা, অতীতমুখী ভাবনায় তাকে আশ্রয় দিতে চাওয়া হয়। সে প্রয়োগিক কৌশল ও বিজ্ঞানের সুবাদে পুঁজিবাদ এগোয়, সেই বিজ্ঞানের চেতনাকে অস্বীকার করে তখন প্রচার করতে হয় ধর্মের বাণী। দ্বিতীয় কারণটি খুবই স্পষ্ট-সুস্থ প্রগতিশীল জীবনবোধ পুঁজিবাদের পক্ষে বিপজ্জনক। যুক্তিবাদ। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি পুঁজিবাদের অস্তিত্বের পক্ষে অসুবিধাজনক। তাকে আটকানোর জন্য প্রয়োজন হয় ধর্মের নেশার, তার অযৌক্তিক, অবৈজ্ঞানিক মত প্রচারের। এই উভয়বিধ কারণেই রেগনের সময় থেকে আমেরিকায়

আবার ধর্ম শিক্ষার উপর জোর পড়েছে—এমনকী ডারউইনের বিবর্তনবাদের পরিবর্তে স্কুল-কলেজে শেখানো হচ্ছে খ্রীস্টীয় সৃষ্টিতত্ত্ব। ভারত বা এই ধরনের রাষ্ট্রগুলিতে ধর্মের প্রয়োজন অনেক স্পষ্ট, সমাজের আভ্যন্তরীণ নানা দ্বন্দ্ব, বিকাশমান শ্রেণীগুলির স্বার্থের সঙ্গে পুরনো শ্রেণীস্বার্থের সংঘাত, আবার নিপীড়িত শ্রেণীর উত্থানের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে তাদের সমঝোতা, এসবের ফলে যে সমস্যা তৈরী হয়, তার অনেকগুলিকেই সাময়িকভাবে উত্তীর্ণ হওয়া যায় ধর্মের নাম করে। কিন্তু সংখ্যাগুরু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংখ্যালঘুদের বিরোধকে জিইয়ে রাখার চেষ্টা চলে এই বিভেদপন্থা, যে কোনো রঙের শাসকদলের পক্ষেই সুবিধাজনক। বস্তুত পাকিস্তান, সৌদি আরব, ইরান ইত্যাদি রাষ্ট্রে এই ধরনের সাম্প্রদায়িক বিরোধের অবকাশ কম, কেননা এই রাষ্ট্রগুলিতে মূলত এক ধর্মাবলম্বী লোকেরই বাস, অথবা ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা সেখানে আদৌ গণনীয় হওয়ার মতো সংখ্যা নয়, যদিও শিয়া-সুন্নি বিরোধের মতো ঘটনা বিরল নয় এসব দেশে। তবু যে এইসব রাষ্ট্রকে ধর্মের আশ্রয় নিতে হয়, একটি, বিশেষ ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম বলে ঘোষণা করতে হয়, তার কারণ ধর্ম ও ধর্মীয় সংস্কারের নামে অনেক সংকটকে চাপা দেওয়া যায়। সাধারণ মানুষের ধর্ম বিশ্বাসের অন্ধত্বের সুযোগ নিয়ে তাদের অভিমানে সুড়সুড়ি দিয়ে তাদের ন্যায় সংগত বিভোক্ষকে চাপা দেওয়া যায়—ধর্মের নামে শাসক ও শাসিতের সাজানো ভ্রাতৃত্বের কথা প্রচার করা যায়। সর্বোপরি ধর্মীয় বিধানকে রাষ্ট্রীয় আইনের জায়গায় বসিয়ে সামাজিক বৈষম্য ও অন্যায়কে ঈশ্বরনির্দিষ্ট বলে চিহ্নিত করা যায়। তাতে রাষ্ট্রের সমাজ কল্যাণের দায়িত্ব এড়ানো সম্ভব হয়, আর কোনো অন্যায় বা অপরাধের জন্য ন্যায় ও যুক্তিসংগত বিচার ও শাস্তির বদলে ধর্মীয় শাস্তির সাহায্যে সাধারণ নাগরিকের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকে আরো নগ্ন, ভয়ংকর অথচ বিধিসিদ্ধ করে তোলা যায়। অন্যদিকে যেসব রাষ্ট্র নিজেকে ঘোষণা করে ধর্মনিরপেক্ষ বলে, তাদের পদ্ধতি কখনো কখনো আরেকটু সূক্ষ্ম। ধর্মনিরপেক্ষতা আপাতভাবে খুবই প্রগিতশীল ও যুক্তিসংগত ধারণা বলে মনে হয়—কিন্তু এই ধারণাটিও তার প্রয়োগ, দুটিতেই আছে অসংগতি। প্রথম ধর্মনিরপেক্ষতা এখানে ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রের দূরত্ব বা বিচ্ছিন্নতা নয়, সবধর্মকেই সমান মর্যাদা দেওয়ার ভান করে সব ধর্মকেই অবাধ স্বেচ্ছাচারের স্বাধীনতা দেওয়াই হলো এই ধর্মনিরপেক্ষতার উদ্দেশ্য। আর প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই ধারণা হয়ে ওঠে আরো বিপজ্জনক। তা নিরপেক্ষতার ভানও সব সময় বজায় রাখে না। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ধর্ম খুব লজ্জাহীনভাবেই প্রশ্রয় পায়। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার ঘোষণার আড়ালে রাষ্ট্র কতগুলি সুবিধা পেয়ে যায়। রাষ্ট্র যেমন প্রভুত্বকারী শ্রেণীগুলির মতাদর্শগত আধিপত্য চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, ধর্ম সেই চেষ্টারই সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ধর্মনিরেপক্ষতার ভান করে সব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের উপরই এই আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করা যায়। তা সত্ত্বেও একটি বিশেষ ধর্ম প্রশ্রয় পায় কেন—

যেখানে সব ধর্মই কোনো-না-কোনো ভাবে স্থিতাবস্থা টিকিয়ে রাখার সহায়তা করে। এর একটা কারণ অবশ্যই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের অসচেতন ভাবালুতাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের পিছনে অধিক জনসমর্থনকে নিশ্চিত করার প্রয়াস। এ-ভাবে শাসকশ্রেণী দেশের সংখ্যাগুরু অংশের মানুষকে নিজেদের তুলে ধরতে চায় তাদের আপনজন বলে। অন্যদিকে এই সংখ্যাগুরু অংশকে ভাবার সুযোগ করে দেয় যে তারাই শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার—অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের প্ররোচনা আসে রাষ্ট্রীয় তরফ থেকেই। আবার এরই উল্টো দিকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি নিরাপত্তার অভাব বোধ করে। আর রাষ্ট্র তার ধর্মনিরপেক্ষতায় ঔদার্যের ভানে সেই নিরাপত্তার আশ্বাস জোগায় কোনো সমদর্শিতার মনোভাবে নয়, আরো কিছু ধর্মীয় সুযোগ সুবিধা বাড়িয়ে, রাষ্ট্রীক আইনের পরিবর্তে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য ধর্মীয় বিধানের জায়গা করে দিয়ে। এতে অবশ্য সংখ্যালগু সম্প্রদায়ের চেতনার মুক্তির বদলি তাদের আরো ঠেলে দেওয়া হয় সংস্কারের অন্ধকারে, তাতে শাসকশ্রেণীর স্বার্থই সিদ্ধ হয়। সাধারণ মানুষের উপর ধর্মীয় নিগড় আরো কঠিন হয়ে বসে, ধর্মীয় সংস্কারের চাপ পেয়ে যায় রাষ্ট্রীয় আইনের মর্যাদা ও অধিকার, শোষণের চাপ ও সন্ত্রাস আরো তীব্র হওয়ার সুযোগ পেয়ে যায়। এর দ্বারা দীর্ঘদিনে সংগ্রামের দ্বারা অর্জিত মানবমুক্তির নানা জয়মাল্যগুলি দলিত হয়, সাময়িকভাবে হলেও পিছু হটতে থাকে মানবসভ্যতা—মৌলবাদ এ-ভাবেই পেয়ে যায় তার বিস্তারের জায়গা।

তথাকথিত ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মকেই প্রকারান্তরে রাষ্ট্রীয় ধর্ম করে তোলার পদ্ধতি নানামাত্রিক। একটি অত্যন্ত স্থূল ভঙ্গি হলো, যেখানে রাষ্ট্রীয় নেতারা তাদের সরকারি পদের গুরুত্ব, মর্যাদা ও ন্যূনতম আচরণবিধিকে বিসর্জন দিয়ে প্রকাশ্যে ধর্মস্থানে গিয়ে আরাধনা করেন, কোনো ধর্মগুরুর কাছে আশীর্বাদ ভিক্ষা করেন, বিশেষ ধর্মীয় পোশাক পরিধান করেন, ধর্মীয় আচার পালন করেন, অর্থাৎ বিশেষ ধর্মের প্রতি তাদের আনুগত্যকে রাষ্ট্রনেতা হিশেবেই প্রকাশ্য করে তোলেন, তাকে আর ব্যক্তিগত রাখেন না। এর ফলে, তাদের পদাধিকারের জন্যই ঐ বিশেষ ধর্মমতটি রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পেয়ে যায়। অবশ্য রাষ্ট্রনায়করা অন্য ধর্মের অনুষ্ঠানে গিয়ে তাদের সঙ্গে প্রার্থনায় বসেন, বা দু-একটি আবার পালন করেন, কিন্তু এর লোকদেখানো আড়ম্বর এতই স্পষ্ট যে তা আরো বিরূপতা বাড়ায়। এর ফলে তাদের নিরপেক্ষতা স্বাভাবিকভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাছে সন্দেহের বিষয় হয়ে ওঠে, তাঁরা নির্দিষ্ট হয়ে ওঠেন। আরেকটি ভাঙ্গন সূক্ষ্ম ও বেশি বিপজ্জনক। সরকারি অনুষ্ঠানে, নানা উপলক্ষে, রাষ্ট্রীয় উৎসবে যে-সব আচার পালিত হয় তার কিছুটা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে আহৃত, যার কিছুটা সংখ্যাগরিষ্ঠদের ধর্মীয় প্রথা মাত্র। এর ফলে ধর্ম ও সংস্কৃতিকে মিশিয়ে ফেলা হয়। এইভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠদের ধর্মীয় আচরণকে সংস্কৃতির নাম করে সরকারি প্রথায় পরিণত করা হয়, চাপিয়ে দেওয়া হয় অন্য

ধর্মের মানুষের উপর, ফলে তারা মানসিকভাবে একধরনের প্রতিরোধ অনুভব করেন, আর এই চাপ বিদ্বেষকে বাড়িয়ে তোলে। ধর্মনিরপেক্ষতা এ-ভাবে হয়ে ওঠে মূলত সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মের আধিপত্য—যদিও তা কখনো স্বীকার করা হয় না। এই আধিপত্যের ধারণা রাষ্ট্রীয় প্রশ্রয়ে এতটাই জোরদার হয়ে ওঠে যে তা অন্য ধর্মকে আক্রমণ করাই কর্তব্য বলে মনে করে। সরকারি তরফে লোকদেখানো প্রতিরোধকে তখন সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মের উপর নিষেধাজ্ঞা বা আক্রমণ বলে প্রচার করা হয়। ধর্মীয় সংখ্যাগুরু তখন রাষ্ট্রীয় অনুকূল্য আরো বেশি দাবি করে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আরো বেশি ভাগ চায় মৌলবাদ তার থাবা বাড়াতে চায় প্রত্যক্ষভাবে। এর প্রতিক্রিয়ার অন্য ধর্মগুলিও তখন আশ্রয় নেয় মৌলবাদেই। একটি ব্যাপার অবশ্য এ-ব্যাপারে স্মর্তব্য। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালানোর সহায়ক হিশেবে, শোষণ চালিয়ে যাওয়ার পদ্ধতি হিশেবে ধর্মকে ব্যবহার করা হয় কিন্তু এইসঙ্গে তা রাষ্ট্রনায়কদের ধর্মীয় আচ্ছন্নতার ফলও বটে, অর্থাৎ রাষ্ট্রনায়করা ধর্মকে ব্যবহার করেন তাদের নিজেদের সংস্কার মোহ থেকেও।

ধর্ম ও রাষ্ট্রের এই সংযোগ অবশ্য একমাত্র চিত্র নয়। এই সংযোগ সত্য সেখানেই, যেখানে ধর্ম একটি প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা পেয়েছে। এর বিপরীতে ধর্মের একটি লৌকিক চেহারাও আছে। বিজ্ঞান চেতনা, যুক্তিবাদ ইত্যাদি দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা সন্নিহিত বিষয়গুলি নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। সে-প্রশ্নের আলোয় লৌকিক ধর্মকেও ভ্রান্ত বলেই মনে হতে পারে। তবু এই ধর্মের একটা ভিন্ন দিকের কথা স্বীকার করতেই হয়। লৌকিক ধর্ম ও বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল, যুক্তির পথ সেখানে অজানা, কিন্তু এখানে মানবিক আবেদন অনেক বেশি; তা ঈশ্বরের নামে মানবতা বিরোধী হয়ে উঠতে পারেনি; বরং তারা মানবিক সংযোগকেই ঈশ্বরসাধনার পথ বলে মনে করেছে। অবশ্যই এও আবেগেরই ব্যাপার—কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম বুদ্ধি দিয়ে আবেগকে পরিচালিত করার চেষ্টা করে, লৌকিক ধর্ম আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের উপর নির্ভরশীল। ফলে সযত্ন চর্বিত যেসব ভাবনা দিয়ে সাধারণ মানুষের আবেগকে ইচ্ছামতো নানাদিকে চালিত করা হয়, এখানে তার সুযোগ কম; বরং দৈনন্দিনের অভিজ্ঞতা, পারস্পরিক চেনা জানা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে মানবিক সংযোগের আবেগ প্রবাহিত হয় বলে লৌকিক ধর্ম সাম্প্রদায়িকতার বদলে এক উদার ভ্রাতৃত্বের কথা ভাবতে পারে। আর সে-কারণেই লৌকিক ধর্ম হয়ে ওঠে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের প্রতিস্পর্ধী। সেইজন্যই রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তা অপ্রয়োজনীয়, রাষ্ট্রের কাছে তারা অস্তিত্ব বিহীন। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম এখানে তার বিপদ অনুভব করে। তাই সবসময়ই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম লৌকিক ধর্মকে আক্রমণ করার চেষ্টা করে, কখনো বা বুদ্ধিমানের মতো তাকে আত্মসাৎ করার চেষ্টা করে। এই আক্রমণ এখন আবার ফিরে আসে নতুন শক্তি নিয়ে মৌলবাদের অন্যতম সক্রিয়তাই হলো এই আক্রমণ, যার লক্ষ্য তার নিজের ধর্মেরও কিছু অভিব্যক্তি।

সূফী বা বাউলের ধর্মমত মৌলবাদের কাছে গ্রাহ্য হতে পার না। এই মতগুলি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মমতের বাইরেই নিজেদের স্বতন্ত্র এক অভিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে—কোনো কোনো সময়ে তারও প্রয়োজন হয়নি। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় দেখা যায়, এ রকম কোনো উদারনীতিক ধর্মমতের আওতায় না গিয়েও, তারা যে যার নিজস্ব ধর্মকে বজায় রেখেও মিলতে পেরেছে কোনো সর্বজনীন ধর্মস্থানে, পীরের দরগায় বা কোনো থানে, ভিন্ন ধর্মের পালাপার্বনে যোগ দিতে পেরেছে শুধু দর্শক হিশেবে নয়, অংশগ্রহণকারী হিশেবেই। সাম্প্রদায়িকতার বিষ যখন বেশি উগ্র হয়ে উঠেছে, তখন হয়ত বাকি এসেছে—কিন্তু তা সাময়িক। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষ অন্য সম্প্রদায়কে নিজেদের ধর্মের পরিধিতে থামতে বাধা দেয়, অর্থাৎ তার আক্রমণ অন্য ধর্মের বিরুদ্ধে, আর মৌলবাদ তার নিজের ধর্মের মানুষকে আটকায় অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে মেলামেশায়, ভাববিনিময়ে—অর্থাৎ সে পীড়ন চালায় নিজের ধর্মের মধ্যেই, আক্রমণ করে তার নিজের লোকজনকেই।

বস্তুত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ মৌলবাদের অন্যতম লক্ষণ—কিন্তু মৌলবাদ এখানেই থেমে থাকে না, তা হয়ে ওঠে আরো ব্যাপক ও প্রচণ্ড। সাম্প্রদায়িকতা নির্ভর যুক্তিহীন আবেগের উপর, এক অলীক শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা থেকে তা তৈরি করে বিদ্বেষের আবহাওয়া। আর বিরামহীনভাবে কোনো ঘটনা বা জনশ্রুতিকে উপলক্ষ করে, এক বা একাধিক ব্যক্তির নির্দেশে, একটি-দুটি শ্লোগান অবলম্বন করে এক সম্প্রদায় ঝাঁপিয়ে পড়ে অন্য সম্প্রদায়ের উপর; কিন্তু মৌলবাদ যেহেতু শুধু একটি অভিব্যক্তি নয়, তা একটি বিশেষ ভাবনা, চেতনা। এই ভাবনাটিকে পরিপুষ্ট, প্রসারিত ও দৃঢ়ভাবে গ্রথিত করার জন্য শুধু আবেগের উপর নির্ভর করলে চলে না। আবেগকে উসকে দিয়ে উত্তেজনা ছড়ানো যায়, কিন্তু কোনো সম্প্রদায়, সঙ্ঘ বা সংগঠনকে বাঁধতে গেলে শুধু আবেগ দিয়ে চলে না, তার জন্য প্রয়োজন হয় অধিকদিন স্থায়ী কোনো কৌশল, যা নীতির ছদ্মবেশ পড়তে পারে। তাই সাজাতে হয় যুক্তির ভান বা কুযুক্তি। মৌলবাদ আসলে এক স্বেচ্ছাচারী, একনায়কতান্ত্রিক প্রবণতা, তা বাইরের বা ভিতরের কোনো আপত্তিকে সহ্য করে না। কিন্তু ভিতরের বিরোধিতাকে আনুগত্যে রূপান্তরিত করতে গেলে কয়েকটি দীর্ঘস্থায়ী আবেগকে তৈরি করতে হয়, তেমনি তৈরি করতে হয় পুরনো সংস্কারের সপক্ষে নানা যুক্তি। বোঝাতে হয় যে-সব কুপ্রথা; সংকীর্ণতা অগ্রসর চেতনায় বাতিলযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিল আগেই, সেগুলিই ছিল প্রয়োজনীয়। এজন্য কখনো কখনো এমনকী বিজ্ঞানের আবরণও ব্যবহার করা হয়। ফলে মৌলবাদকে অতীতের কথা বলতেই হয়, বলতেই হয় পুরনো মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনার কথা। বিজ্ঞানের ছদ্মবেশ অবশ্য নেহাৎই প্রাথমিক পর্যায়ের ব্যাপার—মানুষকে উলটোদিকে হাঁটতে গেলে প্রথমে ভান করতে হয় যেন সামনেই এগোনো হচ্ছে;

কিন্তু কিছুটা হাঁটতে পারলে তখন আর এই আড়ালটুকুও থাকে না, পিছনে হাঁটাই তখন শ্রেয় বলে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়। আর এ-ভাবে ধর্মীয় মৌলবাদ আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে তার সম্প্রদায়ের ভিতরেই—গর্ব করতে থাকে তারই সদস্যদের মানবিক অধিকার। ধর্ম তার শুরুর দিনগুলিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার তাগিদেই জোর দেয় শৃঙ্খলার উপর, কিছু নিয়ম ও দৃঢ়াব্দ্ধ প্রথা তৈরি করে নেয়। নানা কারণেই পরবর্তীকালে এগুলো একটু শিথিল হয়ে যায়—প্রতি মুহূর্তের জীবনযাত্রায় তার চাপ ততটা জোরদার থাকে না, সব নিয়মকানুন অক্ষরে অক্ষরে পালন করার বাধ্যবাধকতা থাকে না। মৌলবাদ আবার তা ফিরিয়ে আনতে চায় অন্যভাবে। মধ্যপর্বের শিথিলতা অবশ্য ঐতিহাসিক কারণেই ঘটে সামাজিক পরিস্থিতির ক্রমপরিবর্তমান চেহারাই এই শৈথিল্যের কারণ। আর রাষ্ট্রীয় মদতের বাইরে যখন সাম্প্রদায়িকতা একটি মনোভাব হিশেবে থেকে যায় সমাজে, তখন এই সাম্প্রদায়িকতার পরিপুষ্টির জন্যই শৈথিল্যকে কিছুটা প্রশ্রয় দিতে হয়—নিজের ধর্মের লোকের উপর কড়াকড়ি কমিয়ে স্বধর্ম সম্পর্কে তাকে কোনো আপত্তির সুযোগ দেওয়া হয় না, বেশ হাল্‌কা মনে সে বিধর্মী নিধনে এগোতে পারে। কিন্তু মৌলবাদ হলো স্বধর্মকেই গুছিয়ে নেওয়া, তাকে দৃঢ়ভাবে বাঁধা। এবং যেহেতু সামাজিক পরিস্থিতি এখন আর তার বিকাশের অনুকূল নয়, তাই তাকে জোর দেখাতেই হয়, সহজ ও স্বাভাবিক পদ্ধতির বদলে। সামাজিক পরিস্থিতি অনুকূল নয়, কিন্তু ভাঙাগড়া এক ভুল প্রতিক্রিয়ায়, ইতিবাচক শক্তিগুলির সাময়িক দুর্বলতায় মৌলবাদ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পায়, তাই সে নিজেকে কঠিন ও শক্তিশালী বলে প্রতিপন্ন করতে চায়। মৌলবাদ ফিরিয়ে আনতে চায় ধর্মের প্রথম যুগের প্রথা ও শৃঙ্খলাকে, স্বাভাবিকভাবেই শুরুতে যা ছিল অনুরাগীদের আত্মসমর্পণের উপর নির্ভরশীল। এখন তা হয়ে ওঠে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া।

এই চাপিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে মৌলবাদ আবার তার কুযুক্তিগুলোকে প্রয়োগ করতে চায় আবেগের উন্মাদনার সাহায্যেই। ফলে তাকে জোর দিতে হয় সেই সব দিকেই, যা মানবিক বোধকে ধ্বংস করে। শুরুর শৃঙ্খলকে ফিরিয়ে আনতে চাইলেও মৌলবাদ শুরুর প্রগতিভাবনাকে ফিরিয়ে আনতে চায় না, তার বদলে সে বড়ো করে তোলে ধর্মের অবক্ষয়ের সময়কার নোংরামিকেই। তখন আর পিছু হাঁটা সেই অলীক সত্যযুগে গিয়ে শেষ হয় না, শেষ হয় তার আগেই, যেখানে পীড়ন, সন্ত্রাস, মানবিকতার অবমাননা স্বাভাবিক বলে মনে হতো, অর্থাৎ মৌলবাদ টেনে নিতে চায় মধ্যযুগের অন্ধকারে। এর সব থেকে বড়ো উদাহরণ বোধহয় নারী সম্পর্কিত মৌলবাদী ভাবনায়। এ-কথা ঠিক পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর মর্যাদা প্রথম থেকেই অস্বীকৃত, বৈদিক সাহিত্যেই নারীকে পাপিষ্ঠা ও অশুচি বলে চিহ্নিত করেছে, তাকে পশুর সমগোত্রীয় বলে ভেবেছে, কোরাণে

বহুবারই জানানো হয়েছে নারী পুরুষের থেকে অনেক হীন, বাইবেল মেনে নিয়েছে ইভের পাপের জন্যই মানবের দুর্দশার শুরু, বুদ্ধদেব রাজি হননি মেয়েদের সন্ন্যাস গ্রহণে। কিন্তু নানা নিয়ম করে মেয়েদের যাবতীয় অধিকার খর্ব করার চেষ্টা চলল আগে পরবর্তীকালে—চাপিয়ে দেওয়া হলো পীড়ন আর সন্ত্রাস। আজ মৌলবাদ আবার ফিরিয়ে আনতে চায় সেইসব নিয়ম। ইরানের খোমেইনি ফতোয়ায় মেয়েদের সব অধিকার হারানো, বা সম্প্রতি আলজিরিয়ায় পুরসভার নির্বাচনে জিতে-আসা মৌলবাদীদের নির্দেশে নারীপুরুষের অফিস আলাদা করে, মেয়েদের অফিস উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘিরে দেওয়া—এ সবই 'নারী নিকৃষ্ট' এই নোংরা ধারণাকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চাওয়ার লক্ষণ। কিন্তু উদার হিন্দুধর্মের চেহারাটা কেমন। বেশিদূর যেতে হয় না, দেওরালার রূপ কানোয়ারের ঘটনাই নগ্ন করে দেয় এই ঔদার্যের আসল রূপটি। রূপ কানোয়ারের ঘটনা বিপজ্জনক শুধু একটি মেয়েকে জোর করে সতী করা হয়েছে বলে নয়, বিপদটা বেশি কেননা এখানে এই ঘটনাকে এই ঘটনার পিছনের মনোভাবকে যৌক্তিক বলে প্রমাণ করার চেষ্টা চলছে কোনো কোনো মহলে, চেষ্টা করা হয়েছে একে মহিমান্বিত করে তোলার। এই হলো মৌলবাদের চেহারা, একটু পালিশ আছে বলে যা আরো ভয়ংকর।

মৌলবাদ আজ নানা চেহারায় আত্মপ্রকাশ করছে। এর বীজ থেকে যায় আগে থেকেই। বাংলাদেশের স্বদেশি-আন্দোলনে গীতা ছুঁয়ে বা কালীমূর্তির পা ছুঁয়ে দল আসার বাধ্যবাধকতা শুধু যে রাজনীতিক ধর্মাশ্রিত করে তোলা তাই নয়, তা দেশসেবায় একমাত্র হিন্দুদের ভূমিকাকেই স্বীকার করার অন্ধত্ব—এ অন্ধত্ব এক মৌলবাদী প্রবণতারই পূর্বাভাস, যার আরো আভাস থেকে গিয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এ। ধর্ম হিশেবে হিন্দুধর্ম অবশ্য অনেক বেশি গোঁড়া, যদিও তার ঔদার্যের ভানও অনেক বেশি। তার গোঁড়ামি এতটাই যে ধর্মান্তরিত হয়ে অন্য ধর্মে যাওয়া সহজ, কিন্তু হিন্দুসমাজ কোনো বিধর্মীর হিন্দুত্ব গ্রহণকে স্বীকার করতে চায় না। এই গোঁড়ামির উপর ছদ্মবেশ অনেক রকমের। ধর্মের নাম করে নারীকে অবমাননাত তাই এখানে ছদ্মবেশ পরে। রূপ কানোয়ারাদের ঘটনা আজ আবার জোর করে ঘটানো হচ্ছে—একদা এ ছিল স্বাভাবিক, সেই নোংরা স্বাভাবিকতাকে আন্দোলন করে দূর করা হয়েছিল—কিন্তু রামকৃষ্ণ যখন তাঁর স্ত্রী-কে মাতৃজ্ঞানে পুজো করেন, তখন এই বিকৃতি সাধুবাদ পায় উচ্চতর সাধনা বলে। এই ব্যাপারটি বাহবা পেয়েছিল সম্ভবত সামন্ততান্ত্রিক পিছুটানে বাঁধা বাঙালির প্রগতিবাদী হয়ে ওঠার দোলাচলে, স্ত্রী-কে মাতৃরূপী ভাবায় এক ছদ্ম সম্মানের ব্যাপার আছে, তাতেই বাঙালি জীবনের ঐ দ্বন্দ্ব কিছুটা স্বস্তি পেয়েছিল।

কিন্তু রূপ কানোয়ারের ক্ষেত্রে আর এর প্রয়োজন হয় না। মুসলিম মৌলবাদ কতখানি প্রবল তা টের পাওয়া যায় শাহবানু মামলায়। সম্প্রতি জানা গেছে মেদিনীপুরের পটুয়ারা,

যারা দীর্ঘকাল ধরে পটে নানা দেবদেবীর ছবি এঁকে দেখিয়ে বেড়াতেন, তাদের এই অসাম্প্রদায়িক কাজে বাধা এসেছে—তারা যেহেতু মুসলিম, মৌলবাদীরা নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে পটে হিন্দু দেবদেবীদের ছবি আঁকায়। এই হলো মৌলবাদের আক্রমণের চেহারা। কিন্তু সংখ্যালঘুর মৌলবাদ অপেক্ষা সংখ্যা গুরুর মৌলবাদ অনেক বেশি বিপজ্জনক, কেননা শুধু সংখ্যাধিক্যের জোরেই তা ফ্যাসিবাদী আক্রমণ নামিয়ে আনতে পারে। তার জন্য চাই রাজনীতিক সক্রিয়তা। মুসলিম লীগের দ্বিজাতিতত্ত্ব একদা দেশভাগ ঘটিয়েছিল, কিন্তু তখন মুসলিম সমাজের একটি উদীয়মান শ্রেণী রাজনীতিক ও আর্থনীতিক প্রাধান্যের জন্য ব্যবহার করেছিল ধর্মকে, আর আজ ভারতীয় জনতা পার্টির মধ্যে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ রাজনীতিক শক্তি হিশেবে আত্মপ্রকাশ করছে—ফলে এটি আরো বেশি ভয়ংকর।

মৌলবাদ আজ এক ঐতিহাসিক সংকট সৃষ্টি করেছে এ-কথা মানতেই হয়। পুঁজিবাদের বিকৃত চেহারা, সমাজতন্ত্রের নাম করে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন পার্টি-আমলাতন্ত্র, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার যাবতীয় সুফলকে বিনষ্ট করা, উপনিবেশের আর্থনীতিক সংকট, এ-সবই সাময়িকভাবে হতাশ করে তোলে মানুষকে তখন সান্ত্বনা খোঁজে ধর্মের আশ্রয়ে। তাই ধর্মের বা মৌলবাদের পুনরুত্থানের একটা দায়িত্ব নিতেই হয় প্রগতিবাদীদের। এ-কথা ঠিক যতদিন না তৈরি হচ্ছে শোষণ যুক্ত মানবসমাজ, যতদিন না ধর্ম ও ঈশ্বরকে মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় করে তোলা যাচ্ছে, ততদিন মৌলবাদ ফিরে আসবেই নানারূপে, তার বিরুদ্ধে লড়াই তাই জারি রাখতেই হয়। সে-লড়াই লড়বে কোনো সরকার বা রাষ্ট্র নয়, জনগণনই।